এনকাউন্টার

প্রসূন ব্যানার্জি

ছবি: দেবাশিস রায়

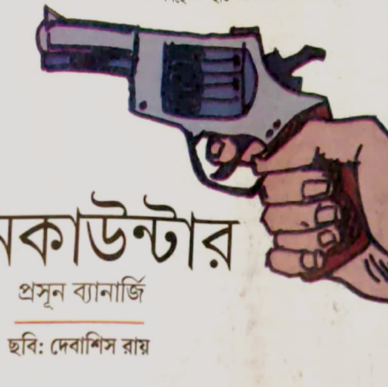

চার্জটা ফ্রেম হয়ে যাচ্ছে আজ। ট্রায়ালটা শুরু করিয়ে দেব কয়েকদিনের মধ্যেই।

হালকা লেবু দেওয়া চায়ে আলতো একটা চুমুক দিলেন দুঁদে পাবলিক প্রসিকিউটর অবনীমোহন সেন। দেখতে দেখতে প্রায় ৩০ বছর হয়ে গেল এই পেশায়। বরাবরই প্রসিকিউশনে। লোয়ার কোর্টে শুরু করে আজ সেশন কোর্টে আলিপুরের সবচেয়ে নামকরা পি পি মানে পাবলিক প্রসিকিউটর।

কিন্তু আজ অবনীমোহন একটু অন্যমনস্ক। আসলে মামলাটাই একটু অন্যরকম। আসামি একজন অফিসার-ইন-চার্জ। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনারই একটি থানার ওসি। অরুণাভ চ্যাটার্জি। মামলার প্রধান আসামি সেই। সঙ্গে আছে আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী।

স্টেট ভার্সেস: অরুণাভ চ্যাটার্জি অ্যান্ড আদার্স। অরুণাভর বিরুদ্ধে অভিযোগ গুরুতর। ফলস এনকাউন্টার করার অভিযোগ। অভিযোগ ঠান্ডা মাথায় গুলি করে বাবন দাস বলে একটি ছেলেকে খুন করার। আর তারপর রেকর্ড ম্যানিপুলেট করে, মিথ্যা এফআইআর করে, প্রমাণ করার চেষ্টা যে ওটা জেনুইন এনকাউন্টার।

'স্যর, বাবনের স্ত্রী এসেছে আপনার সঙ্গে দেখা করতে'— মার্জিত গলায় বলল সুদীপ।

বছর খানেক হল হাজরা ল' কলেজ থেকে পাশ করে কাজ করছে অবনীবাবুর সেরেস্তায়। কাজ শিখছে। ব্যাকরুম ওয়ার্কে সুদীপ বেশ ভাল। কিন্তু অবনীবাবু মনে করেন, একটু মুখচোরা হওয়ার জন্য কোর্টে মার খেয়ে যাচ্ছে।

— ঠিক আছে বসতে বলো, ডাকছি। অবনীবাবুর আজ একটু সময় লাগছে।

ডিফেন্সের জন্য একেবারে লষ্ট কেস— মনে মনে আওড়ালেন অবনীমোহন সেন। প্রসিকিউশন কেসটা এত সলিড যে শেখর সেনের মতো ডিফেন্স ল'ইয়ারও খুব একটা আশা দেখছেন না অরুণাভর। কাঁচা এনকাউন্টার। বাজে কভার আপ। নব্বই শতাংশ পুলিশ এনকাউন্টারই ফলস হয়। কিন্তু এটা একেবারে ল্যাজেগোবরে করেছে পুলিশ। তদন্ত আহামরি কিছু হয়নি। কিন্তু যা মেটেরিয়ালস আছে, তাতে কনভিকশন হয়ে যেতে পারে। অবনীবাবু চা শেষ করলেন।

সোমবার একটু দেরিতেই কোর্টে আসেন অ্যাডভোকেট শেখর সেন। পার্টি অ্যানিমাল। শনি, রবি— দুদিনই পার্টি করেন। মহিমা, মানে মিসেস সেনও তাই। 'গ্ল্যাম ওম্যান' বলতে যা বোঝায় তাই। শিফনে আর স্লিভলেস এমব্রয়ডার্ড ব্লাউজে এখনও অসাধারণ। এক ছেলে। পুনেতে সিমবায়োসিস কলেজে ল' পড়ে। শেখর সেন আর মহিমা সেন তাই ঝাড়া হাত-পা। সপ্তাহে পাঁচদিন কোর্ট আর চেম্বার। শনি-রবি কোনও কাজ নয়। শেখর সেন বলেন, নিজেকে রিচার্জ করা। মিসেস সেন সোশ্যালাইট। এনজিও আছে। পাচার হয়ে যাওয়া মেয়েদের উদ্ধার করার কাজে ব্রতী। শেখর সেন ঠাট্টা করে বলেন, এনজিও-র ফুল ফর্ম হল নিজের জন্য অর্গানাইজেশন। মহিমা সেন অবশ্য এতে রাগ করেন না। নিজের জন্য কি? কত লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। দিল্লি, মুম্বই ঘোরা যায়। সেমিনার-টেমিনারের পরের পার্টিগুলো কী কালারফুল হয়। বিশেষত দিল্লিতে। আমলারা আসেন, পুলিশকর্তারা আসেন, আর থাকেন সোশ্যালাইটরা। এনজিও না করলে, এগুলো দেখতেই পাওয়া যেত না।

অরুণাভর ব্রিফটা শেখর সেন অবশ্য পড়েছেন। এক পুরনো বন্ধুর সুপারিশে কেসটা নেওয়া। ভদ্রলোক এখন ডিআইজি। ভবানী ভবনে বসেন। যখন এসপি ছিলেন তখন থেকে আলাপ। একটা ককটেল পার্টিতে আলাপ হয়েছিল। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এসপি থাকার সময়, অরুণাভ ছিল ওরই ওসি।

এখন আর কিছুই এসে যায় না। তবু একটা বিবেক বোধ আছে ডিআইজি দীপ্তেন্দু রায়ের। ফোন করেছিলেন শেখর সেনকে— 'ট্রায়ালটা আপনি দেখুন। অফিসারটা বিপদে পড়ে গেছে।'

অরুণাভ চ্যাটার্জি। সতেরো বছর হয়ে গেল দারোগাগিরির। বাঁকুড়া ক্রিশ্চান কলেজ থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্সে অনার্স। সাব-ইনস্পেক্টরের চাকরি। ব্যারাকপুরে এক বছরের ট্রেনিংয়ের পরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় প্রবেশন পিরিয়ড এবং প্রবেশন পিরিয়ডেই চোখে পড়ে যায় অরুণাভ। না ভাল কাজের জন্য নয়। বেহিসেবি জীবনযাপনের জন্য। মেসে মদ খাওয়া, মহিলা সঙ্গ— বেশ দ্রুতই অধঃপতনের সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। কিন্তু এত খারাপের মধ্যে একটা পজিটিভ দিক ছিল ওর— সাহস, অলমোষ্ট ডেয়ারিং। হাজার লোকের জমায়েতে, পাঁচজন নিয়ে অক্লেশে লাঠিচার্জ। থানায় হার্ডকোর আসামি ধরে নিয়ে এসে নির্মম জিজ্ঞাসাবাদ। অরুণাভ আসলে খারাপ জগতে বিচরণ করতে স্বচ্ছন্দ ছিল। ওকে অপরাধীরা ভয় পেত। আবার ওর সঙ্গে স্বচ্ছন্দও ছিল। ভাল সোর্স নেটওয়ার্ক তৈরি করতে গেলে এই গুণটা লাগে।

চার বছরের মধ্যে ওসি হল অরুণাভ। গ্রামের থানা, একটু-আধটু ডাকাতি-টাকাতি হয়। একটা পেটমোটা মেজবাবু আর দু'জন এএসআই। ঝামেলা কিছু ছিল, তবে সাঙ্ঘাতিক নয়। ধানকাটার সময় একটু-আধটু মারামারি। আর মাঝে মধ্যে ছোটখাটো চুরি -ছিনতাই। খেয়ে, ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল প্রায় দু'বছর।

ডিও হল প্রায় দু'বছর পর। পুলিশের ডিও মানে পোস্টিং অর্ডার। রিজার্ভ অফিসে ফোনাফুনি, বড় সাহেবের ব্যবসায়ী বন্ধুকে সকালে গুডমর্নিং পাঠানো, বড় সাহেবের মিসেস কোন শোরুমে যান সেখানে হাজির থাকা— নানাবিধ হোমওয়ার্কের ফসল মহেশপুর। শাঁসাল থানা। তেল কাটার পয়সা। সাট্টার রমরমা, নতুন শুরু হওয়া প্রোমোটিং— সব মিলিয়ে প্রাইজ পোস্টিং। কাজটা গুছিয়েই করেছিল অরুণাভ। ২০০৭-এর জানুয়ারি। অরুণাভ চ্যাটার্জি, ওসি মহেশপুর।

কিন্তু মাস দুয়েকের মধ্যেই চেয়ার নড়ে গেল। এমনিতে নতুন ছেলে। কিছু কাগজ-কলমের দুর্বলতা তো ছিলই, তার সঙ্গে পরের এসপি-র অন্যরকম স্টাইল। এফআইআর ঠিক মতো ফিল আপ হচ্ছে না কেন? জেনারেল ডায়েরি ফাঁকা কেন? পার্সোনাল ডায়েরি সময়ে পাঠানো হয়নি কেন সিআই অফিসে? এ সব হাজারো প্রশ্ন। সিনিয়র সাব-ইনস্পেক্টররা তাদের প্রিয় সিআই, ডিএসপি-দের ধরে কান ভাঙানো শুরু করল। অরুণাভ বুঝল যাওয়াটা শুধু সময়ের অপেক্ষা।

কপালটা খারাপই যাচ্ছিল। এমনিতেই এসপি-র গুডবুকে নেই। তারপর পরপর ক্রাইম হচ্ছে। সালটা ২০০৬-২০০৭। মহেশপুর তখন হু হু করে বাড়ছে। বাড়ছে ব্যবসা। বাড়ছে লোক। বাড়ছে গাড়ির সংখ্যা। শুধু বাড়ছিল না পুলিশ। রিটায়ার করলে রিপ্লেসমেন্ট নেই, ইন-সার্ভিস ট্রেনিংয়ে গেলে কেউ ফেরে না। তেল দিনে ৮ লিটার অথচ থানার গাড়ি ২৪ ঘণ্টা চলতে হবে। চলত, ম্যানেজ করে চলত। এর থেকে তেল, ওর থেকে গাড়ি। পুলিশের তখন সবই আউটসোর্সড। এই পরিস্থিতিতে চেয়ার বাঁচানোর একটা মরিয়া চেষ্টা করল অরুণাভ। গোলমালটা পাকল সেখান থেকেই।

দীপ্তেন্দু ছিলেন একটু সাবেকি। সততা, মাঝারি মানের দক্ষতা আর পরিশ্রমের জোরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মতো জেলার এসপি হয়েছেন। অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ নয়। পুলিশ আরেকটা সরকারি দপ্তর। সরকারি নিয়ম মেনে যা হওয়ার হবে। কোনও ফ্লেক্সিবিলিটি নয়। কমপ্লেন এলেই এনকোয়ারি। আর সামান্য গন্ধ পেলেই ডিপার্টমেন্টাল প্রসিডিং। লক আপে মারা যাবে না কাউকে। আনঅফিসিয়ালি আটকে রেখে ইন্টারোগেশন করা যাবে না। কিন্তু ক্রাইম যেন না হয়।

ক্রাইম হচ্ছিল। সাপ্রেস আর মিনিসাইজ করে রেকর্ড ঠিক রাখছিল অনেক ওসিই। ডাকাতিকে চুরি, চুরিকে মিসিং— এ সব কায়দায় অপরাধের সংখ্যা কমানো আর সিআই সাহেবকে একটু ম্যানেজ করা। এ সব দেখতে তো এসপি আসছেন না। তবু সব তো ম্যানেজ হয় না। যা রেকর্ড করতে হল, তাতেই চাকরি যায় যায় অবস্থা।

সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনাটা ঘটল ২০০৭-এর নভেম্বরে। দুষ্কৃতীদের হাতে মারা গেল এক প্রভাবশালী প্রোমোটার। একটা নির্মীয়মাণ বহুতলের সামনে, দুপুরবেলা তাকে গুলি করল অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। মোট ছ'রাউন্ড গুলি চালায়। সম্ভবত নাইন এম এম পিস্তল থেকে। দুটো পেটে, একটা বুকে, তিনটি লক্ষ্যভ্রষ্ট।

দুপুরে ভাত ঘুম দিচ্ছিল অরুণাভ। রবিবারটা ঘুমোতে ভালবাসে। আর সব পুলিশের মতো রাত জাগার অভ্যাস আর বাধ্যবাধকতা, দুপুরে ঘুমনোর ব্যারাম তৈরি করেছে ওর মধ্যে। টিভি দেখতে দেখতে চোখটা লেগে এসেছিল।

মোবাইলটা বেজে উঠল। অতনু। ওফ্, মিডিয়ার লোকগুলো একটা দিনও ছাড়বে না। 'দাদা কোনও খবর আছে?' এই দিয়ে শুরু হবে। তারপর টানবে। কোথায় এএসআই লরি থামিয়েছিল, তা বড় সাহেবের নজরে এসেছে। ডিউটি অফিসার সেদিন যে ভদ্রমহিলাকে উল্টোপাল্টা কথা বলেছে, উনি ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানান। কথাটা ডিআইজি সাহেবের কানে কালকে গেছে টলি ক্লাবের পার্টিতে। এরকম দু'চারটে খবর দিয়ে চেষ্টা করবে নার্ভাস করে দিতে। তারপর সময় মতো সাইজ করে কাটা।

— হ্যাঁ ভাই বলো। ঘুম জড়ানো চোখে বলল অরুণাভ। তারপরেই খবরটা একটু নাটকীয় ভাবে বলল অতনু, 'জাস্ট হয়েছে, ওর সোর্স ফোনে এই মাত্র বলেছে।'

— শালা আজকাল সাংবাদিকদের নেটওয়ার্ক পুলিশের চেয়ে অনেক ভাল হয়ে গেছে। পুরোটা শোনার মতো অবস্থাও ছিল না। মরে গেছে? নার্ভাস লাগল অরুণাভকে। — বোধহয়। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। একটা নামী বেসরকারি হাসপাতালের নাম বলল অতনু।

তারপরেই ঝড়ের মতো শুরু হল ফলোআপ। কন্ট্রোল রুম থেকে শুরু করে এসপি সকলকে একই কথা বলা, আর গালাগালি খাওয়া। যেন গুলিটা ওই করেছে। আর টি মোবাইলের বুড়ো অফিসারটাকে বোঝাতে পাক্কা তিন মিনিট। 'আর শালা যান না ১৩ নং ওয়ার্ডে। শালাকে বলো রাস্তায় লরি ধরতে, তখন কোনও ব্রিফিং লাগে না।' ঘটনাস্থলে তখন বিভিন্ন ছোট, বড়, মেজ চ্যানেলের সবজান্তা ক্রাইম রিপোর্টাররা এলাকার আইন-শৃঙ্খলার অবনতি আর পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার ওপর মানুষের উদ্বেগকে তুলে ধরতে ব্যস্ত। শেষ ছিনতাইটা কবে হয়েছিল বাড়ির বউদি জানাচ্ছেন। সেক্টর পাঁচের কল সেন্টারে ক্লাস টুয়েলভ পাশ করা যে মেয়েটা শুধু ইংরেজি বলার জোরে তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী হয়ে উঠেছে সেও বলছে— 'হাউ আনসেফ দ্য প্লেস হ্যাজ বিকাম'। শকুনের দল। মনে মনে সাংবাদিকদের গালাগালি দিয়ে একটু পাশে সরে দাঁড়াল অরুণাভ। কারা করল? কোন গ্যাং? টাকা চেয়েছিল? মোবাইল কল লিস্ট আর ডাম্প বের করা প্রয়োজন। দ্রুত ফোন করল ওসি মনিটরিং সেলকে।

বিশ্বজিৎ দে, জুনিয়র, ভাল ছেলে। 'বিশ্বজিৎ প্রোমোটারের নাম্বারটা লেখো, লাষ্ট ১৫ দিনের কল লিস্ট আর আজ ঘটনার ৩০ মিনিট আগে-পরের এই টাওয়ারের ডাম্প আনা। একটু দেখো ভাই, বিপদে পড়ে গেছি।'

মোটামুটি রাত ১০টা পর্যন্ত হাতড়ে কিছু পাওয়া গেল না। কটিন সোর্স লাগাল, আর মোবাইল সেটটার কল লগ দেখে কিছু লোকের সঙ্গে কথাবার্তা। সময় লাগবে।

কিন্তু সময় কে দেবে? সিআই সাহেব বললেন, 'বড় সাহেব খুব অ্যানয়েড, তোমাকে সাসপেন্ড না করে দেয়। কালকের মধ্যে ডিটেকশন করতেই হবে।'

স্যর স্যর করে ফোনটা নামিয়ে একটা কাঁচা খিস্তি এল অরুণাভর মুখে। সবই টাইম বাউন্ড। আজকে মরলে, কালকের মধ্যে ধরতেই হবে। আসলে যে লোকগুলো কখনও ক্রাইমওয়ার্ক করেনি, তারাই এরকম নির্বোধের মতো কথা বলে।

পরের দিনের কাগজের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সর্বাধিক বিক্রিত একটি বাংলা দৈনিক এর মধ্যে পুলিশের দুর্নীতির গন্ধও খুঁজে পেয়েছে। অর্গানাইজড ক্রাইম বেড়েই চলেছে। এসপি অবশ্য বলেছেন যে, থানার গাফিলতি থাকলে ছাড় কেউ পাবে না। থানার মানে পড়ুন ওসি-এর, মনে মনে ভাবল অরুণাভ।

যেন সব লোকের পিছনে একটা করে সিকিউরিটি গার্ড দেওয়া উচিত।

খবর এল পরের দিন সন্ধেয়। একটা পুরনো সোর্স এসে জানাল, স্যর কাল দুপুরে বাবন, জ্যাকি আর মিন্টে, সায়েন্স সিটির সামনে থেকে একটা জায়গায় জড়ো হয়েছিল। পাকা খবর, একটা ট্যাক্সিওয়ালা বলেছে, ওদেরই পাড়ার, একটু দেখুন স্যর।

জ্যাকি আর মিন্টের অনেক চেষ্টা করেও হদিশ পাওয়া গেল না। যাওয়ার কথাও ছিল না। কলকাতা পুলিশের এক দাপুটে অফিসারের সোর্স হওয়ার সুবাদে, জ্যাকিকে ধরা যে কঠিন, সেটা অরুণাভ জানত। যেটা জানত না, সেটা হচ্ছে মিন্টেটাও এক পুলিশ অফিসারের সোর্স হয়ে গেছে। মুশকিল, খুব মুশকিল— মনে মনে ভাবল অরুণাভ।

খবরটা দিল ওরই এএসআই মজিদ। কনস্টেবল থেকে আঠারো বছর ঘষার পরে এএসআই। ভেবেছিল কনস্টেবল হয়েই রিটায়ার করতে হবে। কিন্তু যতটা খারাপ ভাবে জীবন শেষ করার পরিকল্পনা করেছিল মজিদ, ততটা খারাপ হল না। প্রোমোশন মিলল। আর তারপরেই অরুণাভর কাছে প্রথম পোস্টিং।

পুলিশের কাছে সবচেয়ে কঠিন জায়গা হল ফিল্ড। ঠান্ডা ঘরে বসে জ্ঞান-বিতরণ করা আর 'দেখ লো' বলা সহজ। কঠিন হল দেখা। তবু মজিদদের মতো কেউ কেউ ঝুঁকি নেয়। ফেঁসে গেলে কেউ বাঁচায় না। দুনিয়ার এনকোয়ারি শুরু হয়। কেন গেলে? সোর্স কে? অন্যের জুরিসডিকশনে রেইড করলে, আর লোকাল ওসিকে বললে না? পুলিশ থেকে অপরাধী হয়ে যেতে কয়েক মিনিট লাগে। তাও ঝুঁকি নেয় লোকে। তাই ডিপার্টমেন্টটা টিকে আছে।

বাবন। খোঁজ পাওয়া গেছে। লায়লা বলে একটা মেয়ের কাছে খুব যাচ্ছে আজকাল। বাগুইআটিতে ডাউন টাউনে নাচে লায়লা। এই নতুন ডান্সিংবারগুলো আজকাল ভাল ব্যবসা করছে। পেগ প্রতি দাম একটু বেশি। কিন্তু গান আর নাচের সঙ্গে মদ খাওয়ার মধ্যে কোথাও একটা পুরনো জমিদারি স্টাইল আছে। যে পাবলিক ভিড়ে অস্বচ্ছন্দ, তারা ভিড় জমায় এ সব ডান্সিংবার-এ। পেট মোটা প্রোমোটার, এলাকার দাদা, আর 'ফিক্সার'দের চারণভূমি এগুলো। মজিদও যায়। কাজও হয়। ফূর্তিও হয়। পুলিশ বলে একটু বেশি খাতির, যদিও লোকাল থানার নয়। জুবেইদা বলে একটা মেয়েকে নিয়ে দিনকতক মজা করেছিল মজিদ। এখানেই আলাপ। দু'পাঁচশো টাকা হাতে দিলে, আদরও দেয়, খবরও দেয়।

জুবেইদাই ফোন করেছিল, স্যর লায়লার কাছে একটা ছেলে রোজ আসছে। হাতে প্রচুর টাকা। একটা হেভভি সানগ্লাস দিয়েছে লায়লাকে। আপনাদের ওদিককার। মনে হয় হঠাৎ কিছু টাকা করেছে।

এই হঠাৎ করা টাকা খরচ করার একটা ঝোঁকি স্ট্রিট রাফিয়ানদের থাকে। জীবন এদের কাছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি। একজন ভাল অ্যাডভোকেট ধরে রাখতে হবে। যাকে সারা বছর লাগবে। তার জন্য একটা খরচা আছে। কিছু সংসার খরচ ছাড়া বাকি পুরোটাই ফূর্তিতে কাজে লাগে। কাল হো না হো।

— 'কেমন দেখতে রে? মাথায় টুপি পরে সবসময়? আচ্ছা, কায়দা করে মোবাইলে একটা ছবি তুলে রাখতে পারবি? এক হাজার দেব।'

পরের দিন দুপুরে জুবেইদাকে আদর করতে করতে ছবিটা দেখল মজিদ। শালা বাবন, এদিকে আজকাল মজা নিচ্ছে? মজিদের পেটটা গুড়গুড় করে উঠল, বড়বাবুকে বলতে হবে।

বাবনকে তোলা হল রাতে লায়লার ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর পর। কেউ দেখেনি। সোজা সুমোয় চাপিয়ে নিউ টাউনের পেছন দিকে। অ্যাক্সিস মলের পাশ দিয়ে কেএলসি থানার নির্জন রাস্তায়। মজিদ চায়নি কিন্তু অরুণাভ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিল গাড়িতেই ধোলাই। পুরোটাই কনফেস করল বাবন। যদিও এভিডেন্স অ্যাক্ট-এ এই কনফেশনের কোনও দাম নেই। শালা, একটা রিকশাওয়ালারও ক্রেডিবিলিটি পুলিশের থেকে বেশি। অরুণাভর মাথা পরিষ্কার কাজ করছে।

কাল কোর্টে ফরওয়ার্ড করলে হেফাজতে নেওয়া যায়। চোদ্দোদিন ম্যাক্সিমাম। তাও দাপুটে অ্যাডভোকেট। আর মিনমিনে এপিপি হলে মেরেকেটে তিনদিন। কাস্টডিতে মারা যাবে না। কমপ্লেন হলে বড় সাহেব সাসপেন্ড করে দেবে। তারপর নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশিট দিলেও, যে কোনও সময় জামিন হয়ে যেতে পারে। আবার লোক মারবে। আবার ওসি গালাগাল খাবে। আবার মিডিয়া আইনশৃঙ্খলার অবনতি দেখবে। আর অরুণাভর মহেশপুর থানার শাঁসাল চেয়ারটা যাবে। না, বাঁচিয়ে রেখে লাভ নেই।

বডি পাওয়া গেল পরের দিন। ওসি, কে.এল.সি. সন্দীপ একটা মার্ডার কেস করে ফেলে রাখল। তখনও বডি আইডেন্টিফাই হয়নি। কে.এল.সি-র সেকেন্ড অফিসার সুবীর একবার ধরেছিল বাবনকে। ও চিনত। সুবীর দিন তিনেক পরে ছুটি থেকে ফিরে এলে কেসটা নতুন মাত্রা পেল।

বাবনের স্ত্রী থানায় এসে প্রচুর নাটক করল— 'সুবীরদা আপনি তো জানেন ও আজকাল প্রোমোটিং করছিল। ভাল হয়ে গিয়েছিল। কে মারল?'

পুলিশে এ সব খবর লিক হতে বেশি সময় লাগে না। ভাড়া গাড়ি ড্রাইভার, বড়বাবুর খাস লোক, ডাকমাষ্টারের বিরোধী গোষ্ঠী— খবর বেরোবেই।

সুবীরের বহু দিনের লক্ষ্য মহেশপুর। পলিটিক্যাল সেটিং ঠিকই আছে। কিন্তু এসপিকে ম্যানেজ করতে হবে। কী করে চ্যানেলটা করা যাবে, সেটাই মাথায় কিছুদিন ঘুরপাক খাচ্ছিল সুবীরের।

সিআই সাহেবকে ধরল— 'স্যর এটা একটু সুগার পিটারের কানে দিয়ে দিন। একটা নোকিয়া লুমিয়ায় সিআই সাহেব রাজি।

বাবনের স্ত্রী কেস করল। সুবীরের বুদ্ধিতেই। ওয়ান ফিফটি সিক্স, (ক্রজ থ্রি), কোর্ট কমপ্লেন। তড়িঘড়ি থানায় রেজিস্টার্ডও করে দিল বড়বাবুকে বুঝিয়ে।

ডিফেন্স সাজানোর আগেই তিন গোল খেয়ে গেল অরুণাভ। প্রথমে তো বেলটা করতে হবে। সিআইডি তদন্তভার নিল।

শেখর সেনকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন এসপি নিজেই। আমি আজকাল আর বেইল ম্যাটার খুব বেশি করাই না। ট্রায়ালটা দেখে দেব, চার্জশিটের পর।

অগত্যা বেইল এক্সপার্ট মহিতোষ রায়। ভাল ম্যানেজ করেন। আইও থেকে আইজি— সকলের সঙ্গেই ভাল সম্পর্ক। লোকে বলে আইনের নয়, লাইনের ল'ইয়ার।

সেশনসে রিজেক্ট হওয়ার পর, হাইকোর্টে আগাম জামিন হল। দশ লাখ নিলেন মহিতোষ। আইপিএস বন্ধুদের ফাইভ স্টারে লাঞ্চে ডাকার আর অন্যান্য খরচ ইনক্লুসিভ। পুলিশের পয়সায় পুলিশ খাবে। মহীতোষরা সমাজে থাকবেন হোয়াইট কলার হিসেবে। অরুণাভরা বিতর্কিত পুলিশ হিসেবে।

সিআইডির চার্জশিটের পর শেখর সেন ট্রায়ালটা ধরলেন। তদন্ত দারুণ কিছু না হলেও ঠিকঠাক আছে। অরুণাভর টাওয়ার লোকেশন সেই দিন অব্যর্থ ভাবে পি ও-র কাছে। জেরায় পাবলিক ড্রাইভারটা সবই বলে দিয়েছে। বাবনের স্ত্রী সুবীরের সাহায্যে তিনটে লোকাল সাক্ষীও দিয়েছে, যারা নির্ভেজাল মিথ্যা কথা বলেছে যে তারা আই উইটনেস। অত রাতে তারা ওখানে কী করছিল, সেটা ডিফেন্স পরে ক্রসে নেবে। কিন্তু আপাতত চার্জশিট মোটামুটি ফুলপ্রুফ। কপি আগেই সার্ভড হয়ে গিয়েছিল। কেসটা সেশনস-এ কমিটও হয়ে গেছে। আজ চার্জ ফ্রেমের দিন। সেশনস-এ বেলটা অবশ্য কনফার্ম করিয়ে নিয়েছেন শেখর সেন। ফলে জেলে আপাতত যেতে হচ্ছে না অরুণাভদের।

চার্জ হিয়ারিং শুরু হল।

কাস্টডিতে নেয়নি। সেশনস-এ বেইলটা কনফার্ম করা ছিল বলে। কিন্তু ক্যানসেল্ড হতে কতক্ষণ? পুলিশ অফিসার, বাইরে থাকলে সাক্ষীকে ভয় দেখাবে, দুটো ফলস জিডি করিয়ে বেইল ক্যানসেলেশনের প্রেয়ার দিতে কতক্ষণ?

শেখর সেন ডিসাইডেড টু ফাইট।

যে কেসটা এতক্ষণ ফুলপ্রুফ মনে হচ্ছিল, সেটার ভিতটা নাড়িয়ে দেওয়ার কাজটা শুরু করলেন শেখর সেন।

ডিসচার্জ চাই। চার্জ ফ্রেমই করতে দেব না। মনে মনে আওড়ালেন মিস্টার সেন। কোথাও একটা জেদ চেপে গেছে। ২২৭ ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডে ডিসচার্জ চাই। মেটেরিয়াল এভিডেন্স নেই।

প্রসিকিউশন ভাবেইনি এই স্টেজেই লড়াই শুরু হবে। সাধারণত এই ধরনের কেসে চার্জ ফ্রেমটা নির্বিঘ্নে হয়ে যায়। সকলেই জানে রুটিন ব্যাপার। যা লড়াই মূল ট্রায়ালে হবে। চার্জ হিয়ারিং, তাই নিজে আসেননি পি পি। এবং ভুলটা এখানেই করলেন।

আর একটা নতুন ফরম্যাটের ম্যাচ দেখল সেশনস কোর্ট। ডিসচার্জ করানোর এই আক্রমণাত্মক লড়াই। অরুণাভ নিজেও এতটা আশা করেনি। চার্জশিট হওয়ার পরে পুরো ট্রায়াল ফেস করতে হবে, এটাই মেনে নিয়েছিল সে।

জিতলেন শেখর সেন। প্রিজাম্পসন ইন ফেভার অফ ইনোসেন্স-এর থিওরিতে ম্যাচ বার করে নিয়ে গেলেন। জয়ের আনন্দে যেটা উপলব্ধি করতে পারবেন না শেখর সেন সেটা হল যে পি পি অবনীমোহন সেনও হাসছেন। পরাজয়ের আনন্দে। হেরে জেতার আনন্দে। নিজে যাননি চার্জ হিয়ারিং করতে। আসলে অরুণাভদের মতো অফিসাররা বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে যাক, তা চান না অনেকেই। ■